এলাকার বড় মাঠে বিশাল করে ত্রিপলের তাঁবু টাঙিয়ে চারপাশ টিন অথবা বেড়া দিয়ে ঘিরে সপ্তাহব্যাপী চলত সেই অনুষ্ঠান। একটু বেশি রাত করেই শো শুরু হত। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজেদের ভালো করে সোয়েটার, চাদরে মুড়ে কাঠের চেয়ারে বা মাটিতে পাতা ত্রিপলের ওপরে বসে দেখতে হত যাত্রাপালা। কথাই ছিল, 'যাত্রা দেখে ফাতরা লোকে'। সেই আসরে ছোটদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না

'পৌষের কাছাকাছি রোদ মাখা সেইদিন, ফিরে আর আসবে কি কখনও'!

হয়তো আর ফিরে আসবে না। কারণ শীত হারিয়েছে তার চিরসঙ্গীদের। আজ সে বড় একা। 'এক মাঘে শীত যায় না!' তাই পৃথিবীর পাক খাওয়া নিয়মে প্রতি পৌষ-মাঘে সে আবার ফিরে আসে। আসলে শীত মানে তো শুধু উত্তাপ কমে যাওয়া নয়, বরং শীত এলে আমাদের আনন্দের উত্তাপটা যেন অনেকটাই বেড়ে যেত। কারণ শীত তার ঝুলিতে উপহার নিয়ে আসত অনেক কিছু। কিন্তু 'সেই শীত' আর আসে কই! শীত বদলে গিয়েছে নাকি সময়ের সঙ্গে আমরাই বদলে যাচ্ছি! বদলে যাচ্ছে আমাদের বোধ! বদলে যাচ্ছে আমাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা! বদলে যাচ্ছে আমাদের জীবন শৈলী! হয়তো এই সব কিছু মিলেই, বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি। বিজ্ঞান এনে দিচ্ছে অনেক কিছু, কিন্তু হয়তো কেড়েও নিচ্ছে তার চেয়েও বেশি। ফলে অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে আমরা হয়ে পড়ছি নস্টালজিক। তাই এখন শীত এলেই হারানোর খতিয়ানের হিসেব কষতে ইচ্ছে করে।

'রাম্বা হো-হো-, সাম্বা হো-হো-হো'! বাতাসে দূর থেকে গানটা ভেসে এলেই বুঝতে হত কোনও ট্রাক বা বাস রঙিন বেলুনে সাজিয়ে একঝাঁক রঙিন পোশাকের উল্লসিত মানুষ চলেছে। দিনটা অবশ্যই রবিবার কিংবা ছুটির দিন। সকাল শুরুর কমলালেবুর তাজা গন্ধ শেষবেলায় বদলে যেত মাদকতায়। শীত আসার অনেক আগে থেকেই গন্তব্য ভেবে রাখা হত। শীত না এলে যেন সেখানে যাওয়া বারণ। এখন সারা বছর দল বেঁধে নানা 'মস্তি'তে শীতের পিকনিক আর আলাদা কিছু নয়। অথচ একটা সময় শীত মানেই পিকনিক, এমনটাই ছিল পিকনিকের মাহাত্ম্য। এখনও পিকনিকে দৌড়োই, কিন্তু দল বেঁধে বছরের অন্যান্য সময়েও আউটিং, শীতের পিকনিকের এক্সক্লুসিভিটিটাকে কোথাও যেন খানিক ম্লান করে দিয়েছে।

সিনেমা হলে সারা সপ্তাহ কিংবা সারা মাসে একটাই সিনেমা চলত। কিন্তু শীত আসা মানেই সিনেমাপ্রেমীদের কাছে সারা সপ্তাহ জুড়ে বিভিন্ন সিনেমা দেখার একটা অপেক্ষা থাকত। তখন বাংলা ছবি মানেই বেশিরভাগ সাদাকালো, কিন্তু হিন্দি ছবি দেখার বাড়তি আকর্ষণই ছিল তার রঙিন চেহারা। এই রংয়ের কারণেই হিন্দি সিনেমার টিকিটের দামও ছিল বেশি। খেলার মাঠে অনেকটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে, তার ভিতরে বাঁশের ফ্রেমে বড় সাদা পর্দা টাঙিয়ে সপ্তাহব্যাপী চলত ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সন্ধে ও রাতে প্রতিদিন দু'টো করে শো। প্রতি শোয়ের রোজের টিকিট কিংবা সারা সপ্তাহের সিজন টিকিটের ব্যবস্থা থাকত। শো চলাকালীন বেড়ার ফাঁক দিয়ে কিছু কৌতূহলী চাউনি ছিল রোজের অঙ্গ। এখন ঘরে ঘরে টেলিভিশনের পর্দায় প্রতি মুহূর্তে নানান সিনেমার সম্ভার। তবুও শীত এলে বড় শহরে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন হয়। কিন্তু সে এখন মাঠ ছেড়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে উঠে এসেছে। বদলে গিয়েছে তার আঙ্গিক ও লক্ষ্য। শীত হারিয়েছে তার মাঠের সঙ্গীকে।

শীতের পথে ঘাটে বাতাসে ভেসে আসত হিন্দি ও ইংরাজিতে অদ্ভুত নরম আওয়াজের ধ্বনি। তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই দর্শকের উল্লাসের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ত রেডিয়োর মধ্যে দিয়ে। কানে ছোট্ট রেডিয়ো ধরে পথ চলা কারও উদ্দেশে 'দাদা কত হল?' প্রশ্নটা ছিল খুব কমন। কোথাও বা খানিক বড় রেডিয়োর সামনে রোদে পিঠ দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জটলা ছিল অতীতের শীতের পরিচিত ছবি। পাঁচদিনব্যাপী টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে গাভাসকর, কপিল দেব, বিষেন সিং বেদি, ম্যালকম মার্শাল, ইমরান খান এই মানুষগুলো শীতের চরিত্র হয়ে উঠত। রেডিয়োতে ক্রিকেট কমেন্ট্রি ততদিন শুধুই শোনার জিনিস ছিল যতদিন না সাদাকালো টিভি এলে সেই জায়গার দখল নেয়। এখন সারা বছরের ক্রিকেট তার চরিত্র বদলেছে। শুধুমাত্র শীতের সঙ্গে ক্রিকেটের যে বন্ধুতা, সে সম্পর্কে চিড় ধরেছে অনেকদিন।

টেলি দুনিয়ার বাড়বাড়ন্ত না থাকায় বিনোদনের অবকাশ ছিল আজকের তুলনায় সীমিত। ফলে সকাল থেকে সংসারের কাজকর্ম সেরে দুপুরে রোদে বসে মহিলাদের আড্ডা ছিল রোজের রুটিন। মুখের সঙ্গে হাতও চলত সমান গতিতে। শীত আসছে কিংবা এসেছে আর বউদি, মাসিমা, কাকিমাদের হাত খালি! এমনটা ভাবাই যেত না। কাজটা ছিল খানিকটা শখের দায়িত্বও। শীত আসার আগেই প্রিয়জনের জন্য সে ছিল উচ্চারণ না করা শপথ। আড্ডা চলত আর তার সঙ্গে ধীরে ধীরে পূর্ণতা পেত হাতের বস্তুটি। ব্যক্তিগত গতির ওপর নির্ভর করত এই শীতে তার সংখ্যা কত হবে। নিত্যনতুন নকশার সন্ধান কিংবা সোজা-উল্টোর ফর্মুলার আদানপ্রদানও হত শীতের রোদে বসেই। সময়ের সঙ্গে পোশাক পরিচ্ছদে এসেছে বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন। সবাই এখন রেডিমেড জ্যাকেটের সন্ধানে। তাই হাতে বোনা সোয়েটারের আবদারও আর নেই। তাই উল আর কাঁটা নির্ভর শীতের শৌখিন কারুশিল্পটিরও অবসান হয়ে যাচ্ছে জেনারেশন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে।

টিভির পর্দায় এখন জন্তু-জানোয়ার দেখার হরেক রকম চ্যানেল। বাচ্চাদের হাতে ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বিভিন্ন ধরনের গেম। বাচ্চা থেকে বড় প্রত্যেকেরই বিনোদনের নিজস্ব নানাবিধ সুযোগ। তাই শুধুমাত্র শীতকেন্দ্রিক কোনও বিশেষ বিনোদনের আর কেউ অপেক্ষা করে না। অথচ একটা সময় অপেক্ষায় থাকত সবাই। বড় হাঁ করা জলহস্তী আর বাঘের হালুম ছবির পাশে ট্রাপিজে দড়ির উপর স্বল্পবসনা সুন্দরীর সঙ্গে জোকারের পোস্টারের উপর বড় করে লেখা থাকত, 'আসিতেছে'। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত সেই খবর। পোস্টারের সেই আগমন বার্তা যেন খানিকটা শীতের আগমনকেও ঘোষণা করত। দুপুর থেকে রাত মোটে তিনটে শো হত। অন্ধকার নেমে এলে আকাশের দিকে একবার তাকাতেই হত। সেখানে ঘূর্ণায়মান লম্বা আলোর রেখা জানিয়ে দিত শহরে সার্কাস এসেছে। একদিন সার্কাস শেষ হয়ে যখন তাঁবু খোলা শুরু হত, বাতাস বলে দিত শীতও চলে যাচ্ছে। এ ভাবেই সার্কাস আর শীত মিলেমিশে ছিল। সার্কাস হয়তো আজও আসে, কিন্তু আমাদের অনুভূতিকে তেমন স্পর্শ করে না। জীবজন্তুর খেলা বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গা পূরণ করেছে স্বল্পবসনা নারীরা। তাই সার্কাসের দর্শকের মধ্যেও এসেছে ভিন্নতা। তাই 'শীতের সার্কাস' ভাবনা বদলে গিয়ে, সার্কাসেই শীত এসেছে।

'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ'! সেই নিয়মে আজ পৌষের নিজেরই সর্বনাশ। বদলে গিয়েছে তার আদল। পৌষপার্বণ ছিল বাংলার উৎসবগুলোর মধ্যে রসনা নির্ভর এক বিশেষ আকর্ষণ ও অপেক্ষা। এখন সারা বছর বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে সন্দেশের পাশে 'ওরা'ও শুয়ে থাকায় শুধুমাত্র শীতের সঙ্গে তার আর কোনও বিশেষ আত্মীয়তা নেই। অথচ একটা সময় শুধুমাত্র শীত এলেই খেজুরের গুড়ের সঙ্গে পিঠেপুলির বৈচিত্র রসনাকে তৃপ্ত করত মা-ঠাকুমাদের হাত ধরে। রেডিমেড জীবনে আমাদের সে ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। মা-ঠাকুমাদের সঙ্গে সঙ্গে শীতের রসনার এই বিশেষ দিকটিও আজ অনেকটাই গল্পকথা।

রিকশা না অটোর পিছনে ছোট্ট দর্মার টুকরোর উপর উগ্র সাজের সুন্দরী রমণীদের খানিক সাহসী ছবির পোস্টার সাঁটিয়ে, খেঁকুরে একটি লোক নির্দিষ্ট একটি ঢঙে মাইক ফুঁকে ফুঁকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত। নামগুলোও ছিল অদ্ভুত। দূর থেকে গান সমেত মাইকের ঘোষণা কানে এলেই ছুটে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানোর একটাই উদ্দেশ্য থাকত, ছুড়ে দেওয়া লাল, নীল, হলুদ রংয়ের হ্যান্ডবিল কুড়নো। সেইগুলো কুড়নোতে যতটা আগ্রহ ছিল, হাতে নিয়ে পড়ার তেমন কোনও দায় ছিল না। কারণ তাতে কোনও ছবি থাকত না। তারপর এলাকার বড় মাঠে বিশাল করে ত্রিপলের তাঁবু টাঙিয়ে চারপাশ টিন অথবা বেড়া দিয়ে ঘিরে সপ্তাহব্যাপী চলত সেই অনুষ্ঠান। একটু বেশি রাত করেই শো শুরু হত। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজেদের ভালো করে সোয়েটার, চাদরে মুড়ে কাঠের চেয়ারে বা মাটিতে পাতা ত্রিপলের ওপরে বসে দেখতে হত যাত্রাপালা। কথাই ছিল, 'যাত্রা দেখে ফাতরা লোকে'। সেই আসরে ছোটদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। এখনও কিছু আধা গ্রাম-শহর এলাকায় যাত্রা অনুষ্ঠান হয় ঠিকই, কিন্তু গ্রাম জীবনেও বিনোদনের বিভিন্ন বিকল্প পন্থা চলে আসায়, শীত এলেই যাত্রার কথা আর আলাদা করে মনে পড়ে না।

পথেঘাটে মরশুমি 'গিটারিস্ট'কে মনে পড়ে! পরিযায়ী পাখির দল লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতা চিড়িয়াখানার ঝিলে এসে বসে। শীতে শেষের সঙ্গে সঙ্গে তারাও ফিরে যায়। সেই পাখির দল আজও আসে। সেই পরিযায়ী পাখির মতোই ঠিক শীতের সময়টায় এলাকার অলিতে গলিতে বেশ লম্বা একটা গিটারের মত যন্ত্রে 'ট্যাং ট্যাং' আওয়াজ করে

এখন সারা বছর দল বেঁধে নানা 'মস্তি'তে শীতের পিকনিক আর আলাদা কিছু নয়। অথচ একটা সময় শীত মানেই পিকনিক, এমনটাই ছিল পিকনিকের মাহাত্ম্য